রেইনকোট

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

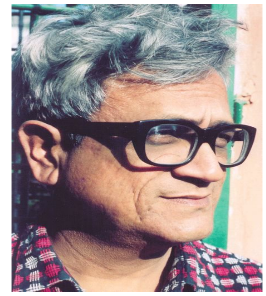

লেখক-পরিচিতি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বগুড়া শহরের নিকটে নারুলি গ্রামে। তাঁর পিতা বদিউজ্জামান মুহম্মদ ইলিয়াস ছিলেন পূর্ববঙ্গ পরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য, মাতার নাম মরিয়ম ইলিয়াস। তাঁর পিতৃদত্ত নাম আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস। তিনি বগুড়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে আইএ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি সরকারি কলেজে বাংলা বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি সমাজ, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সচেতন একজন শক্তিমান লেখক। তিনি জীবন ও জগৎকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছেন। অনাহার, অভাব, দারিদ্র্য ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবন-যাপন করছে সে-সব অবহেলিত মানুষের জীবনাচরণ তাঁর গল্প ও উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে উঠে এসেছে। তিনি লেখার সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর জোর না দিয়ে জোর দিয়েছেন লেখার গুণগত মানের ওপর। এদেশের প্রগতিশীল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক সমর্থন ছিল। তাঁর পাঁচটি গল্পগ্রন্থে মোট গল্পের সংখ্যা ২৮টি। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যকর্ম :

উপন্যাস : *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৭), *খোয়াবনামা* (১৯৯৬);

গল্পগ্রন্থ : *অন্যঘরে অন্যস্বর* **(১৯৭৬)**, *খোঁয়ারি* (১৯৮২), *দুধেভাতে উৎপাত* (১৯৮৫), *দোজখের ওম* (১৯৮৯), *জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল* (১৯৯৭);

প্রবন্ধগ্রন্থ : *সংস্কৃতির ভাঙাসেতু* (১৯৯৮)।

ভূমিকা

'রেইনকোট' (১৯৯৫) গল্পটি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ *জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল* (১৯৯৭) গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এ গল্পের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-১' থেকে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময় ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণের পরিস্থিতি নিয়ে গল্পটি রচিত হয়েছে। গল্পে রেইনকোটের প্রতীকী তাৎপর্য অসাধারণ। রেইনকোটের মাধ্যমে সাধারণ ভীরু মানুষের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার সাহস, উষ্ণতা ও দেশপ্রেম কীভাবে সঞ্চারিত হয়েছে তা লেখক সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'রেইনকোট' গল্পটি পড়ার পর আপনি–

- মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- একজন মুক্তিযোদ্ধার রেইনকোট কীভাবে এক ভীতু প্রকৃতির মানুষকেসাহসী ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাক-বাহিনীর বর্বরতার চিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা কীভাবে পাকবাহিনীকে সহায়তা করেছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ভোররাত থেকে বৃষ্টি। আহা! বৃষ্টির ঝমঝম বোল। এই বৃষ্টির মেয়াদ আল্লা দিলে পুরো তিন দিন। কারণ শনিতে সাত মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন। এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট। স্পেসিফিক ক্ল্যাসিফিকেশনও আছে। যেমন, মঙ্গলে ভোররাতে হইল শুরু, তিন দিন মেঘের গুরুগুরু। তারপর, বুধের সকালে নামল জল, বিকালে মেঘ কয় এবার চল। বৃহস্পতি শুক্র কিছু বাদ নাই। কিন্তু এখন ভুলে গেছে। যেটুকু মনে আছে, পুরু বেড-কভারের নিচে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আর-একপশলা ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্যে তাই যথেষ্ট। অন্তত তিন দিন ফুটফাট বন্ধ। বাদলায় বন্দুক-বারুদ কি একটু জিরিয়ে নেবে না? এই কটা দিন নিশ্চিন্তে আরাম করো।

তা আর হলো কই? ম্যান প্রোপোজেস–। এমন চমৎকার বাদলার সকালে দরজায় প্রবল কড়া নাড়া শেষ হেমন্তের শীত শীত পর্দা ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলল। সব ভেস্তে দিল। মিলিটারি! মিলিটারি আজ তার ঘরে। আল্লা গো। আল্লাহুম্মা আন্তা সুবহানকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জোয়ালেমিন। –পড়তে পড়তে সে দরজার দিকে এগোয়। এই কয়েক মাসে কত সুরাই সে মুখস্থ করেছে। রাস্তায় বেরুলে পাঁচ কালেমা সব সময় রেডি রাখে ঠোঁটের ওপর। কোনদিক থেকে কখন মিলিটারি ধরে। –তবু একটা না একটা ভুল হয়েই যায়। দোয়া মনে হলো ঠিকই কিন্তু টুপিটা মাথায় দিতে ভুলে গেল।

দুটো ছিটকিনি, একটা খিল এবং কাঠের ডাশা খুলে দরজার কপাট ফাঁক করতেই বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপ্‌টার সঙ্গে ঘরে ঢোকে প্রিন্সিপ্যালের পিওন। আলহামদুলিল্লাহ! মিলিটারি নয়। পিওনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু লোকটার চিনচিনে গলা গম্ভীর স্বরে হাঁকে, "স্যার নে সালাম দিয়া।" বলেই ভাঙাচোরা গালের খোঁচাখোঁচা দাড়িতে লোকটা নিজের বাক্যের কোমল শাঁসটুকু শুষে নেয় এবং হুকুম ছাড়ে, "তলব কিয়া। আভি যানে হোগা।"

কী ব্যাপার?

বেশি কথা বলার সময় নাই– কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে কারা বোমা ফাটিয়ে গেছে গত রাতে।

মানে?

"মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকটিরি টেরানসফার্মার তোড় দিয়া। অওর অয়াপস যানেকা টাইম পিরিনসিপাল সাহাবকা কোঠিমে গেরেনড ফেকা। গেট তোড় গিয়া।"

ভয়াবহ কাণ্ড। ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার তো কলেজের সামনের দেওয়াল ঘেঁষে। দেওয়ালের পর বাগান, টেনিস লন। তারপর কলেজ দালান। মস্ত দালান পার হয়ে ফুঠবল ও ক্রিকেট খেলার মাঠ। মাঠ পেরিয়ে একটু বাঁ দিকে প্রিনসিপ্যালের কোয়ার্টার। এর সঙ্গে মিলিটারি ক্যাম্প। কলেজের জিমন্যাশিয়ামে এখন মিলিটারি ক্যাম্প। প্রিনসিপ্যালের বাড়ির গেটে বোমা ফেলা মানে মিলিটারি ক্যাম্প অ্যাটাক করা। সামনের দেওয়ালে বোমা মেরে এতটা পথ ক্রস করে গেল কী করে? সে জানতে চায়, "ক্যায়সে?"

প্রিনসিপ্যালের পিওন জানবে কী করে? "উও আপ হি কহ সকতা।"

মানে? সে-ই বা বলবে কী করে? পিওন কি তাকে মিসক্রিয়ান্টদের লোক ভাবে নাকি? –তার মাথাটা আপনাআপনি নিচু হলে মুখ দিয়ে পানির মতো গড়িয়ে পড়ে, "ইসহাক মিয়া, বৈঠিয়ে চা টা খাইয়ে। আমার এই পাঁচ সাত মিনিট লাগেগা।"

‘নেহি।’ নাশতার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়ে ইসহাক বলে, “আব্দুস সাত্তার মিরধাকা ঘর যানে হোগা। আপ আভি আইয়ে। এক কর্নেল সাহাব পঁওছ গিয়া। সব পরফসরকো এত্তেলা দিয়া। ফওরন আইয়ে।”

কর্নেলের নেতৃত্বে মিলিটারির হাতে কলেজটা এবং তাকেও ন্যস্ত করে ইসহাক বেরিয়ে যায়, রাস্তায় ঘড়ঘড় করতে থাকা বেবি ট্যাকসির গর্জন তুলে সে রওয়ানা হলো জিওগ্রাফির প্রফেসরের বাড়ির দিকে। ইসহাক নিজেই এখন মিলিটারির কর্নেল বললেও চলে। তবে ভোরবেলা কলেজের ভেতরে কর্নেল খোদ চলে আসায় সে হয়ত ডেমোটেড হয়েছে লেফটেন্যান্ট কর্নেলে। আরও নিচেও নামাতে পারে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের এদিকে তাকে ঠেলা মুশকিল। মিলিটারি প্রাদুর্ভাবের পর থেকে তাকে দেখে কলেজের সবাই তটস্থ। এপ্রিলের শুরু থেকে সে বাংলা বলা ছেড়েছে। কোনকালে দাদা না পরদাদার ভায়রার মামু না কে যেন দিল্লিওয়ালা কোন সাহেবের খাস খানসামা ছিল, সেই সুবাদে দিনরাত এখন উর্দু বলে।

“যেতেই হবে? অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজে তোমার হাঁপানির টানটা আবার–।” বৌয়ের এসব সোয়াগের কথা শুনলে কি তার চলবে? বৌ কি প্রিনসিপ্যালের ধমকের ভাগ নেবে? এর ওপর কলেজে কর্নেল এসেছে। কপালে আজ কী আছে আল্লাই জানে! ফায়ারিং স্কোয়াডে যদি দাঁড় করিয়েই দেয় তো কর্নেল সাহেবের হাতে পায়ে ধরে ঠিক কপালে গুলি করার হুকুম জারি করানো যায় না? প্রিনসিপ্যাল কি তার জন্যে কর্নেলের কাছে এই তদবিরটুকু করবে না? পাকিস্তানের জন্যে প্রিনসিপ্যাল দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়ছে। সময় নাই অসময় নাই আল্লার দরবারে কান্নাকাটি করে এবং সময় করে কলিগদের গালাগালিও করে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি প্রিনসিপ্যাল মিলিটারির বড়ো কর্তাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করেছিল, পাকিস্তান যদি বাঁচাতে হয় তো সব স্কুলকলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাও। এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা। পাকিস্তানের পাক সাফ শরীরটাকে নীরোগ করতে হলে এসব কাঁটা ওপড়াতে হবে। তা মিলিটারি ডক্টর আফাজ আহমদের পরামর্শ শুনেছে, গ্রামে-গঞ্জে যেখানেই গেছে প্রথমেই কামান তাক করছে শহিদ মিনারের দিকে। দেশের একটা কলেজে শহিদ মিনার আর অক্ষত নাই। তা প্রিনসিপ্যাল তাদের এত বড়ো একটা পরামর্শ দিল, আর সামান্য এক লেকচারারকে গুলি করার সময় শরীরের আলতুফালতু জায়গা বাদ দিয়ে কপালটা টার্গেট করার অনুরোধটা তার মানবে না? আবার প্রিনসিপ্যালকে সে এত সার্ভিস দিচ্ছে, তার কলিগের, তওবা, সাব-অর্ডিনেটের জন্যে এতটুকু করবে না?

প্যান্টের ভেতর পা গলিয়ে দিতে দিতে সে শোনে রান্নাঘর থেকে বৌ বলছে, “তাড়াতাড়ি চলে এসো। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে মিরপুর ব্রিজের দিক থেকে গুলির আওয়াজ আসছিল। কখন কী হয়।”

এসব কথা এখন বলার দরকারটা কী? –রেডিও টেলিভিশনে হরদম বলছে, সিচুয়েশন নর্ম্যাল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। দুশমনকে সম্পূর্ণ কব্জা করা গেছে। মিসক্রিয়েন্টরা সব খতম। প্রেসিডেন্ট দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। কিছুদিন বাদে বাদে তার ভাষণ শোনা যায়, আওয়ার আলটিমেট এইম রিমেইনস দ্য সেম, দ্যাট ইজ টু হ্যান্ডওভার পাওয়ার টু দি ইলেকটেড রিপ্রেজেনটেটিভ্স অব দ্য পিপল। সবই তো নর্ম্যাল হয়ে আসছে। বাঙালি, আই মিন, ইস্ট পাকিস্তানি গভর্নর, মন্ত্রীরা ইস্ট পাকিস্তানি। সবই তো স্বাভাবিক। এখন বৌ তার এসব বাজে কথা বলে কেন? ইস! আসমাকে নিয়ে পারা যায় না।

“এই বৃষ্টিতে শুধু ছাতায় কুলাবে না গো।” বৌয়ের আরেক দফা সোয়াগ শোনা গেল, “তুমি বরং মিন্টুর রেইনকোটটা নিয়ে যাও।”

ইস! আবার মিন্টু। বৌয়ের এই ভাইটার জন্যেই তাকে এক্সট্রা তটস্থ হয়ে থাকতে হয়। বাড়ি থেকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মগবাজারের দুই কামরার ফ্ল্যাট থেকেই তো মিন্টু চলে গেল জুন মাসে, জুনের ২৩ তারিখে। জুলাইয়ের পয়লা তারিখে সে বাড়ি শিফট করল। বলা যায় না, ওখানে যদি কেউ কিছু আঁচ করে থাকে। ও চলে যাবার তিনদিন পরেই পাশের ফ্ল্যাটের গোলগাল মুখের মহিলা তার বৌকে জিগ্যেস করেছিল, “ভাবি, আপনার ভাইকে দেখছি না।” ব্যস, এই শুনেই সে বাড়ি বদলাবার জন্যে লেগে গেল হন্যে হয়ে। মিলিটারি লাগার পর থেকে এই নিয়ে চারবার বাড়ি পাল্টানো হলো। এখানে আসার পর নিচের তলার ভদ্রলোক একদিন বলছিল, “আমার ভাইটাকে আর ঢাকায় রাখলাম না। যে গোলমাল, বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।” শুনে বুকটা তার টিপটিপ করছিল, এবার যদি তার শালার প্রসঙ্গ তোলে? নিরাপত্তার জন্যেই সে এখানে এসেছে। কলেজ থেকে দূরে, আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে। শহর থেকেও দূরেই বলা যায়। ভেবেছিল নতুন এলাকা, পুবদিকে জানলা ধরে দাঁড়ালে চোখে পড়ে বিল আর ধানক্ষেত। তা কী বিপদ! এদিকে নাকি নৌকা করে চলে আসে স্টেনগানওয়ালা ছোকরার দল। এদিককার মানুষ চোখে খালি নৌকা দেখে, নৌকা ভরা অস্ত্র। এর ওপর বৌ যদি মিন্টুর কথা তোলে তো

অস্ত্র ঢুকে পড়ে তার ঘরের মধ্যিখানে। মিন্টু যে কোথায় গেছে তা সে-ও জানে তার বৌ-ও জানে। কিসিনজার সাহেব বলেছে, এসব হলো পাকিস্তানের ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার। –মানুষ মেরে সাফ করে দেয়, বাড়িঘর, গ্রাম, বাজারহাট জ্বালিয়ে দিচ্ছে, –কারো কোনো মাথাব্যথা নাই। এসব হলো ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার। –না, না, এ ধরনের ভাবনা ধারে কাছে ঘেঁষতে দেওয়াও ঠিক নয়। নিচের ফ্ল্যাটে থাকে ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিক, তার শ্বশুর নিশ্চয়ই সর্দার গোছের রাজাকার। সপ্তাহে দুইদিন-তিনদিন মেয়ের বাড়িতে রেফ্রিজারেটর, টেপ রেকর্ডার, দামি দামি সোফাসেট, ফ্যান, খাট-পালং সব চালান পাঠায়।

"দেখি তো, ফিট করে কিনা।" আসমা এগিয়ে এসে তার গায়ে রেইনকোট চড়িয়ে দিতে দিতে বলে, "মিন্টু তো আমার চেয়ে অনেক লম্বা। তোমার গায়ে হবে তো?" –দেখো, ফের মিন্টুর দৈর্ঘ্যের তুলনা করে তার সঙ্গে। এই ভাইকে নিয়ে এরকম বাড়াবাড়ি করাটা কি আসমার ঠিক হচ্ছে?

"ভালোই হলো। তোমার গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে। পায়েও বৃষ্টি লাগবে না।" এখানেই আসমার শেষ নয়। রেইনকোটের সঙ্গেকার টুপি এনে চড়িয়ে দেয় তার মাথায়।

"আব্বু ছোটোমামা হয়েছে। আব্বু ছোটোমামা হয়েছে।" আড়াই বছরের মেয়ের সদ্য-ঘুম-ভাঙা গলায় ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে সে চমকে ওঠে, মিন্টু কি ঢুকে পড়লো অস্ত্রশস্ত্র হাতে? এর মানে পিছে পিছে ঢুকছে মিলিটারি। তার মানে–। না, দরজার ছিটকিনি ও খিল সব বন্ধ।

তাকে কি মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে? মিলিটারি আবার ভুল করে বসবে না তো? এর মধ্যে তার পাঁচ বছরের ছেলেটা গম্ভীর চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে রায় দেয়, "আব্বুকে ছোটোমামার মতো দেখাচ্ছে। আব্বু তা হলে মুক্তিবাহিনী। তাই না?"

এ তো ভাবনার কাথা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নতুনরূপে সে ভ্যাবাচ্যাকা খায়। না–! খামাখা ভয় পাচ্ছে। বৃষ্টির দিনে রেইনকোট গায়ে দেওয়াটা অপরাধ হবে কেন? মিলিটারির কি আর বিবেচনাবোধ নাই? প্রিনসিপ্যাল ড. আফাজ আহমদ ঠিকই বলে, "শোনেন, মিলিটারি যাদের ধরে, মিছেমিছি ধরে না। সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজের সঙ্গে তারা সামহাউ অর আদার ইন্‌ভলভ্‌ড।" তা সে তো বাপু এসব থেকে শতহাত দূরে। শালা তার বর্ডার ক্রস করল, ফিরে এসে দেশের ভেতরে দমাদম মিলিটারি মারে। তাতে আর দুলাভাইয়ের দোষটা কোথায়? এই যে মিলিটারি প্রত্যেকদিন এই ঢাকা শহরের বাজার পোড়ায়, বস্তিতে আগুন লাগিয়ে টপাটপ মানুষ মারে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়, –সে কখনো এসব নিয়ে টুঁ শব্দটি করেছে? কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে প্রিনসিপ্যালের কোয়ার্টারের পাশে মিলিটারি ক্যাম্প, ক্লাশট্লাশ সব বন্ধ। ছেলেরা কেউ আসে না। মাস্টারদের হাজিরা দিতে হয়, তাও বহু টিচার গা ঢাকা দিয়েছে কবে থেকে। সে তো রোজ টাইম্‌লি যায়। স্টাফ রুমে কলিগরা ফিসফিস করে, কোথায় কোন ব্রিজ উড়ে গেল, কোথায় সাত মিলিটারির লাশ পড়েছে ছেলেদের গুলিতে, এই কলেজের কোন কোন ছেলে ফ্রন্টে গেছে, –কই, সে তো এসব আলাপের মধ্যে কখনো থাকে না। এসব কথা শুরু হলেই আলগোছে উঠে সে চলে যায় প্রিনসিপ্যালের কামরায়। ড. আফাজ আহমদের খ্যাসখ্যাস গলায় হিন্দুস্তান ও মিসক্রিয়েন্টদের আশু ও অবশ্যম্ভাবী পতন সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী শোনে। ওই ঘরে আজকাল সহজে কেউ ঘেঁষে না। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদকে প্রিনসিপ্যাল আজকাল তোয়াজ করে।

মিন্টুর ফেলে-যাওয়া নাকি রেখে-যাওয়া রেইনকোটে ঢোকার পর থেকে তার পা শিরশির করছে, আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। প্রিনসিপ্যাল তাকে ডেকে পাঠিয়েছে সেই কখন!

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

'আব্দুস সাত্তার মিরধাকা ঘর যানে হোগা। আপ আভি আইয়ে। এক কর্নেল সাহাব পঁওছ গিয়্ সব পরফসরকো এত্তলা দিয়া। ফওরন আইয়ে।'– 'আবদুস সাত্তার মৃধার বাসায় যেতে হবে। আপনি এখনই আসুন। এক কর্নেল সাহেব এর মধ্যেই চলে এসেছেন। সব প্রফেসরকে ডেকেছেন। তাড়াতাড়ি আসুন।' **'উও আপ হি কহ সকতা'–** 'সেটি আপনিই বলতে পারেন।' **ওয়েলডিং ওয়ার্কশপ–** ঝালাই কারখানা। **'ক্যায়সে?'–** 'কীভাবে?' **জেনারেল স্টেটমেন্ট–** সাধারণ বিবৃতি। **ট্রান্সপারেন্ট–** স্বচ্ছ। **'তলব কিয়া। আভি যানা হোগা'–** 'তলব করেছেন। এখনই যেতে হবে।' **'মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকটিরি টেরানসফার্মার তোড় দিয়া ।অওর ওয়াপস যানে কা টাইম পিরিনসিপাল সাহাবকা কোঠিমে গেরেনড ফেকা।**

গেট তোড় গিয়া।'– 'মিসক্রিয়েন্টরা ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দিয়েছে। আবার ফিরে যাওয়ার সময় প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়তে গ্রেনেড ছুড়েছে। গেট ভেঙে গেছে।' **মিসক্রিয়ান্ট–** দুষ্কৃতকারী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার ও তার সেনাবাহিনী এই শব্দটি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহার করেছে। **সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ–** রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রম। মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতাকে পাকিস্তান সরকার ও তাদের সমর্থকরা ১৯৭১ সালে এভাবে অভিহিত করত।**স্পেসিফিক ক্লাসিফিকেশন–** সুনির্দিষ্ট শ্রেণিকরণ।

সারসংক্ষেপ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এ গল্পের ঘটনাবলি গল্পের কথক নুরুল হুদার জবানিতে বিবৃত হয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের কারণে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ বাঁচার জন্য অনেক কৌশল অবলম্বন করতো। এ গল্পের কথকও পাকবাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক সুরা মুখস্থ করেছে। রাস্তায় বের হয়ে পাঁচ কালেমা সবসময় প্রস্তুত রাখে ঠোঁটের ওপর। কলেজের পিওন ইসহাকসহ অনেক প্রফেসর পর্যন্ত উর্দু ভাষা শিখেছে। নুরুল হুদা পাকিস্তানি আর্মির ভয়ে দরজার কড়া নাড়া শুনেই দোয়া ইউনুস পড়তে শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ইসহাকের মতো তোষামোদী চরিত্রের মানুষগুলো পাক বাহিনীকে সহযোগিতা করে। ইসহাক কলেজের প্রিন্সিপালের আজ্ঞাবহ হিসেবে কাজ করে এবং বাংলা ছেড়ে উর্দুতে কথা বলে। সে কাউকে পরোয়া করে না, নুরুল হুদার ওপরও ছড়ি ঘোরায়। ইসহাকের মতো আকবর সাজিদ, প্রিন্সিপাল গং পাকবাহিনীকে গ্রামে ডেকে এনে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও মানুষ হত্যা করে। এমনকি, পাকবাহিনীর কাছে ভালো হওয়ার জন্য সুন্দরী মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'রেইনকোট' গল্পে বৃষ্টি কখন থেকে শুরু হয়েছে?

ক. সকাল খ. ভোর
গ. বিকাল ঘ. সন্ধ্যা

২. 'মিসকিরিয়ান লোগ' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. মুক্তিযোদ্ধাদের খ. বাংলাভাষীদের
গ. মিলিটারিদের ঘ. উর্দুভাষীদের

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ছোট শিশু মেনন। বয়স কতইবা, তিন অথবা চার। একা একা বাইরে বের হতে পারে না। সে ঘরের জানালার শিক ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে স্লোগান দেয়– 'ইয়াহিয়ার গোষ্ঠী কিলাই, রাজাকারের গোষ্ঠী কিলাই, পাকিস্তানির গোষ্ঠী কিলাই।' শত্রুপক্ষের ভয়ে মা মেননকে জানালা থেকে সরিয়ে আনেন।

৩. উদ্দীপকের মেনন 'রেইনকোট' গল্পে কার কথা মনে করিয়ে দেয়?

ক. মিন্টু খ. কর্নেল
খ. আকবর সাজিদ ঘ. ড. আফাজ আহমদ

৪. উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে ফুটে উঠেছে–

i. দেশদ্রোহিতা
ii. দেশপ্রেম
iii. বিশ্বাসঘাতকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পাক-বাহিনীর অত্যাচারের বিবরণসহ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা লিখতে পারবেন।
- পাক-বাহিনীর ক্যাম্পে কীভাবে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সমর্থকদের অত্যাচার করা হতো, সে-সব চিত্র সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

রাস্তায় একটা রিকশা নাই। তা রিকশার পরোয়াও সে এখন করছে না। রেইনকোটের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ড যেতে তার কোনো অসুবিধে হবে না। রেইনকোটের ওপর বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম। কী মজা, তার গায়ে লাগে না একটি ফোঁটা। টুপির বারান্দা বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লে কয়েক ফোঁটা সে চেটে দেখে। ঠিক পানসে স্বাদ নয়, টুপির তেজ কি পানিতেও লাগল নাকি? তাকে কি মিলিটারির মতো দেখাচ্ছে? পাঞ্জাব আর্টিলারি, না বালুচ রেজিমেন্ট, না কম্যান্ডো ফোর্স, নাকি প্যারা মিলিটারি, না মিলিটারি পুলিশ, –ওদের তো একেক গুষ্টির একেক নাম, একেক সুরত। তার রেইনকোটে তাকে কি নতুন কোনো বাহিনীর লোক বলে মনে হচ্ছে? হোক। সে বেশ হনহন করে হাঁটে। শেষ-হেমন্তের বৃষ্টিতে বেশ শীত-শীত ভাব। কিন্তু রেইনকোটের ভেতরে কী সুন্দর ওম। মিন্টুটা এই রেইনকোট রেখে গিয়ে কী ভালোই যে করেছে।

বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে বাসের জন্য তাকে তাকাতে হয় উত্তরেই। মিলিটারি লরির ল্যাজটাও দেখা যাচ্ছে না। আবার তার বাসেরও তো নামগন্ধ নেই। বাসস্ট্যান্ডে জনপ্রাণী বলতে সে একেবারে একলা। রাস্তার পাশে পান-বিড়ি-সিগ্রেটের ছোট দোকানটার ঝাঁপ একটুখানি তুলে দোকানদারও তাকিয়ে রয়েছে উত্তরেই, ওদিকে কি কোনো গোলমাল হলো নাকি? দোকানদার ছেলেটা একটু বাচাল টাইপের। বাসস্ট্যান্ডে তাকে দেখলেই ছোঁড়াটা বিড়বিড় করে, কাল শোনেন নাই? মিরপুরের বিল দিয়া দুই নৌকা বোঝাই কইরা আইছিল। একটা জিপ উড়াইয়া দিছে, কমপক্ষে পাঁচটা খানসেনা খতম। বিবিসি কইছে, রংপুর-দিনাজপুরের হাফের বেশি জায়গা স্বাধীন। এর মধ্যেই ছিপছিপে বৃষ্টিতে লালচে আভা তুলে এসে পড়ল লাল রঙের স্টেট বাস।

বাসে যাত্রী কম। না, না, কন্ডাক্টররা সবসময় যেমন– খালি-গাড়ি বলে চ্যাঁচায়, সেরকম নয়। সত্যি সত্যি অর্ধেকের বেশি সিট খালি। সে বাসে উঠলে তার রেইনকোটের পানি পড়তে লাগল বাসের ভিজে মাটিতে। এ জন্যে তার একটু খারাপ কথা, অন্তত টিটকারি শোনার কথা। কিন্তু তাকে কেউ কিছু বলে না।

ঠোঁটে তার একটু হাসি বিছানো থাকে। এই নীরব কিন্তু স্পষ্ট হাসির কারণ কি এই যে, তার রেইনকোটের পানিতে বাসে সয়লাব হয়ে গেলেও কেউ টুঁ শব্দটি করছে না? তার পোশাক কি সবাইকে ঘাবড়ে দিল নাকি?

খালি রাস্তা পেয়ে বাস চলে খুব জোরে। কিন্তু তার আসনটি সে নির্বাচন করতে পারছে না। টলতে টলতে একবার এই সিট দেখে, পছন্দ হয় না বলে ফের ওই সিটের দিকে যায়। এমন সময় পেছনের দিক থেকে দুজন যাত্রী উঠে পড়ে তাড়াহুড়া করে, 'রাখো রাখো' বলতে বলতে ঝুঁকি নিয়ে তারা নেমে পড়ে চলন্ত বাস থেকে। সে তাদের দিকে তাকায় এবং বুঝতে পারে, এরা পালাল ঠিক তাকে দেখেই। লোক দুটো নিশ্চয়ই ক্রিমিনাল। একটা চোর, আরেকটা পকেটমার। কিংবা দুটোই চোর অথবা দুটোই পকেটমার। নামবার মুহূর্তে দুটোর মধ্যে সর্দার টাইপেরটা তার দিকে পেছন ফিরে তাকাল। সেই চোখ ভরা ভয়, কেবল ভয়।

জুৎসই সিট বেছে নিয়ে সে ধপাস করে বসতেই ফোমে ফস করে আওয়াজ হয় এবং তাতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সামনের সিটে বসা তিনজন যাত্রী। হুঁ! এদেরও সে ঠিক চোর অথবা পকেটমার বলে ঠিক শনাক্ত করে ফেলে। ডাকাতও হতে পারে। কিংবা মিলিটারি কোনো বস্তিতে আগুন লাগিয়ে চলে এলে এরা ছোটে সেখানে লুটপাট করতে। অথবা মিলিটারি

কোথাও লুটপাট করলে এরা গিয়ে উচ্ছিষ্ট কুড়ায়। তিনটেই পরের স্টপেজে নামার জন্যে অনেক আগেই ধরফর করে উঠে দাঁড়ায় এবং বাস থামার সঙ্গে-সঙ্গে নেমে পড়ে ঝটপট পায়। তিনটে ক্রিমিনালের একটাও তার দিকে আর ফিরেও তাকায় না। তার মানে তাকে বেশ ভয় পেয়েছে বলেই তার সঙ্গে চোখাচোখি এড়াতে এদের এত কসরত।

যাক, মিন্টুর রেইনকোটে তার কাজ হচ্ছে। চোর ছ্যাঁচোর পকেটমার সব কেটে পড়ছে। ভালো মানুষেরা থাক। সে বেশ সৎসঙ্গে চলে যাবে একেবারে কলেজ পর্যন্ত।

আসাদ গেট বাসস্টপেজে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বেশ কয়েকজন মানুষ। ছাতা হাতে কেউ কেউ নিজ-নিজ ছাতার নিচে এবং ছাতা ছাড়া অনেকেই অন্যের ছাতার নিচে মাথার অন্তত খানিকটা পেতে দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করতে শরীরগুলোকে আঁকাবাঁকা করছিল। বাস থামালে সে দেখল, একে একে নয়জন প্যাসেঞ্জার বাসে উঠল। সে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাইকে দেখে। তো তার দিকে তাকিয়ে নয়জনের তিনজন 'আরে রাখো রাখো' এবং একজন 'রোখো-রোখো' বলতে বলতে নেমে পড়ল ধড়ফড় করে। শেষের জন বোধ হয় এমনি অর্ডিনারি চোর, ছিঁচকে চোর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর প্রথম তিনটে কোথাও সুন্দরী মেয়ে মানুষ দেখলে মিলিটারিকে খবর দেয় কিংবা মিলিটারির কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে মহল্লায়-মহল্লায় ঘোরে আর সুন্দরী মেয়েদের ধরে এনে পৌঁছে দেয় মিলিটারি ক্যাম্পে। এগুলো হলো রাজাকার। ফের নতুন করে অপরাধীমুক্ত বাসে যেতে এখন ভালো লাগছে। জানালার বাইরে বৃষ্টি আঁশ উড়ছে ঠাণ্ডা হাওয়ায় গাছপালা, লোকজন, দোকানপাট ও বাড়িঘরের ওপর ট্রান্সপারেন্ট আবরণ দেখে তার এক্সট্রা ভালো লাগে। সমস্ত ভালো-লাগাটা চিড় খায়, বাস হঠাৎ করে ব্রেক কষলো। তখন তাকে তাকাতে হয় বাঁয়ে, চোখ পড়ে নির্মীয়মাণ মসজিদের ছাদের দিকে, দরজা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগে তার মুখে এবং নাকের ভেতর দিয়ে সেই হাওয়া ঢুকে পড়ে বুকে, সেখানে ধাক্কা লাগে; ক্রাক-ডাউনের রাত কেটে ভোর হলে মিলিটারির গুলিতে এই মসজিদের ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল মুয়াজ্জিন সাহেব। ঠাণ্ডা হওয়ার ধাক্কা রেইনকোটের তাপে এতটাই গরম হয়ে ওঠে যে, মনে হয় ভিতরে বুঝি আগুন ধরে গেল। মসজিদের উল্টোদিকের বাড়িতে তিনতলায় থাকত তখন তারা। রাতভর ট্যাঙ্কের হুঙ্কার আর মেশিনগান আর স্টেনগানের ঘেউঘেউ আর মানুষের কাতরানিতে তাদের কারও ঘুম হয়নি সে রাতে। ছেলেমেয়ে নিয়ে ছেলেমেয়ের মায়ের সঙ্গে সে শুয়েছিল খাটের নিচে। ভোরবেলা মিলিটারি মানুষ মারায় একটু বিরতি দিলে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ে এবং বন্ধ জানালার পর্দা একটু তুলে সে রাস্তা দেখতে থাকে। রাস্তার ওপরে মসজিদের ছাদে মোয়াজ্জিন সাহেব দাঁড়িয়েছিল আজান দিতে। সাধারণত জুমার নামাজটা সে নিয়মিত পড়ে। তবে সেই ভোরে তার আজান শুনতে ইচ্ছা করছিল খুব। মোয়াজ্জিনের আজান দেওয়াটা সম্পূর্ণ দেখবে বলে সে জানালার ধার থেকে সরে না। সারা এলাকায় ইলেক্‌ট্রিসিটি নষ্ট, মসজিদের মাইক্রোফোন অকেজো। মোয়াজ্জিন সাহেব গমগমে গলায় যতটা পারে জোর দিয়ে বলে উঠল 'আল্লাহু আকবার'। দ্বিতীয়বার আল্লাহর মহত্ত ঘোষণা করার সুযোগ তার আর মেলেনি, এর আগেই সম্পূর্ণ অন্যরকম ধ্বনি করে লোকটা পড়ে যায় রাস্তার ওপর। তো কোনো নামাজের ওয়াক্ত নেই, তবে আজান দেওয়াবে কী করে? এরা বোধ হয় যে কোনো সময়কেই নামাজের ওয়াক্ত ঘোষণা করে নতুন হুকুম জারি করেছে।

মিলিটারি এখন যাবতীয় গাড়ি থামাচ্ছে। গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় রাস্তার ধারে। আরেক দল মিলিটারি স্টেনগান তাক করিয়ে রেখেছে এই মানুষের সারির ওপর। অন্য একটি দল ফের ওই সব লোকের জামাকাপড় ও শরীরের গোপন জায়গাগুলো তল্লাসি করে। মিলিটারি যাদের পছন্দ করছে তাদের ঠেলে দিচ্ছে পেছনে দাঁড়ানো একটা লরির দিকে। তাদের বাসটিতে এসে উঠল লম্বা ও খুব ফর্সা এক মিলিটারি।

এখন বাসের ভিতর কোনো আওয়াজ নাই। যাত্রীদের বুকের টিপটিপ শব্দ এই নীরবতার সুযোগ বাড়ে এবং এটাই তার মাথায় বাজে দ্রাম-দ্রাম করে। বারান্দাওয়ালা টুপির নিচে শব্দের ঘষায় ঘষায় আগুন জ্বলে এবং তার হল্‌ক্কা বেরোয় তার চোখ দিয়ে। তবে একটু নড়ে বসলে মাথার ও বুকের ধ্বনি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং এসবকে পরোয়া না করে সে সরাসরি তাকাল মিলিটারির মুখের দিকে। মিলিটারির চোখ ছুঁচালো হয়ে আসে এবং ছুঁচালো চোখের মণি কাঁটার মতো বিঁধে যায় তার মুখে। সেও তার চোখের ভোঁতা কিন্তু গরম চাউনিটাকে স্থির করে আলগোছে বিছিয়ে দেয় মিলিটারির খাড়া নাকে, ছুঁটলো চোখে, গোঁফের নিচে ও নাক, গোঁফ ও চোখের আশপাশের ও নিচের লালচে চামড়ায়। এতে কাজ হলো। মিলিটারির চোখা চোখ সরে যায় তার মুখ থেকে, নেমে পড়ে তার রেইনকোটের ওপর। মনে হয় রেইনকোটের পানির ফোঁটাগুলো লোকটা গুণে গুণে দেখছে। ভেতরের তাপে এইসব পানির ফোঁটা দেখে মিলিটারির এত থ মেরে যাবার কী হলো? লোকটা কি এগুলোতে রক্তের চিহ্ন দেখে? রেইনকোটের বৃষ্টির ফোঁটা গোণাগুনতি সেরে মিলিটারি হঠাৎ বলে,

‘আগে বাঢ়ো’ বাস হঠাৎ স্টার্ট দিয়ে কয়েক পা লাফিয়ে আগে বাড়ে এবং যাত্রীদের স্বস্তির নিঃশ্বাসের ধাক্কায় অতিরিক্ত বেগে ছুটে পার হয়ে যায় ঢাকা কলেজের গেট। নিউ মার্কেটের সামনে এসে পড়লে সে উঠে দাঁড়ায় এবং হুকুম করে, ‘রাখেন নামবো’। বাস একটু স্লো হলে তার রেইনকোটের জমানো পানি গড়িয়ে পড়তে দিয়ে অপরাধীমুক্ত বাস থেকে নামতে নামতে সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে সে ঠোঁট বাঁকায়, এতে তার সামনের সারি দাঁতও বেরিয়ে পড়ে। যারা দেখেছে তারা তার সেই ভঙ্গিটিকে ঠিক হাসি বলে শনাক্ত করতে পেরেছিল বলে তার ধারণা হয়।

প্রিন্সিপালের কামরায় প্রিন্সিপালের সিংহাসন মার্কা চেয়ারে বসে রয়েছে জাঁদরেল টাইপের এক মিলিটারি পান্ডা। তার ভারিক্কি মুখ থেকে অনুমান করা যায়, পান্ডাটি কর্নেল কিংবা মেজর জেনারেল, অথবা মেজর বা ব্রিগেডিয়ার। তাকে দেখে প্রিন্সিপালের কালো মুখ বেগুনি হয়, ড. আফাজ আহমদ এমএসসি, পিএইচডি, ই পি এস ই এস হওয়ার চেষ্টা করতে করতে স্যার বলে, ‘হি ইজ প্রফেসর হুদা।’

কিন্তু ড. আফাজ আহমদ এমএসসি, পিএইচডি নিজের ভুল সংশোধন না করে পারে না, ‘সরি হি ইজ নট এ প্রফেসর। এ লেকচারার ইন কেমিস্ট্রি।

‘শাট আপ।’

এবার প্রিন্সিপাল থামে।

তাকে এবং আবদুস সাত্তার মৃধাকে নিয়ে মিলিটারি জিপে তোলার আগে জাঁদরেল কর্নেল না ব্রিগেডিয়ার প্রিন্সিপালকে কড়া গলায় বলে, সেনাবাহিনীকে নিয়ে মজা করে শায়েরি করা খুব বড়ো অপরাধ। এবার তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো, তবে কড়া ওয়াচে রাখা হবে। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদের দোহাই পেড়ে প্রিন্সিপালের সুবিধা হয় না। নুরুল উদ্বিগ্ন হয়, সাজিদ সাহেব যদি পালিয়ে না থাকে তো তার কপালে যে কী আছে তা জানে এক আল্লা আর জানে এই মিলিটারি।

তাদের দুজনের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, জিপ চলছিল এঁকেবেঁকে। মস্ত উঁচু একটা ঘরে তাদের এনে ফেলা হলো। চোখ খুলে দিলে সে আবদুস সাত্তার মৃধাকে দেখতে পায় না। জায়গাটাও একেবারে অচেনা। একটা ডেক্-চেয়ারে সে যে কতক্ষণ বসে থাকল তার কোনো হিসাব নেই। তার সামনে একটা চেয়ারে এসে বসল এক মিলিটারি। তাকে ইংরেজিতে নানান প্রশ্ন করে, সে জবাব দেয়। লোকটা চলে গেলে তাকে অন্য ঘরে নিয়ে ফের অন্য একটা লোক এসে তাকে প্রশ্ন করে এবং সে জবাব দেয়। প্রশ্নগুলো প্রায় একইরকম এবং তার উত্তরেরও হেরফের হয় না। যেমন, কিছুদিন আগে তাদের কলেজে কয়েকটা লোহার আলমারি কেনা হয়েছে। ওগুলো বয়ে নিয়ে এসেছিল কারা?

সে জবাব দেয়, ঠিক। অফিসের জন্যে তিনটে, বোটানি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের জন্যে দুটো করে এবং ইংরেজির জন্যে একটা, সর্বমোট দশটি আলমারি কলেজে নিয়ে আসা হয়েছে।

এত কথা বলার দরকার নাই তার। ওই আলমারিগুলো নিয়ে আসা হয় কয়েকটা ঠেলাগাড়ি করে। ঠেলাগাড়িওয়ালাদের তো সে ভালো করেই চেনে।

নুরুল হুদা জবাব দেয়, তাদের সে চিনবে কোত্থেকে? তারা হলো কুলি, সে একজন লেকচারার।

তাহলে সে তাদের সঙ্গে এত কথা বলছিল কেন?

প্রিন্সিপালের আদেশে সে আলমারিগুলোর স্টিলের পাতের ঘনত্ব, দেরাজের সংখ্যা ও আকার, তালাচাবির মান, রঙের মান প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখছিল, তার দায়িত্ব ছিল–।

মিলিটারি শান্ত গলায় তথ্য সরবরাহ করার ভঙ্গিতে বলে, মিসক্রিয়েন্টরা কলেজে ঢুকেছিল কুলির বেশে। এটা তার চেয়ে আর ভালো জানে কে? তারা আজ ধরা পড়ে নুরুল হুদার নাম বলেছে। তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিয়মিত, সে গ্যাঙের একজন সক্রিয় সদস্য।

‘আমার নাম? সত্যি বলেছ? আমার নাম বলেছ?’ নুরুল হুদার হঠাৎ চিৎকারে মিলিটারি বিরক্ত হয় না, বরং উৎসাহ পায়। উৎসাহিত মিলিটারি ফের বলে, কুলিরা ছিল ছদ্মবেশী মিসক্রিয়েন্ট। তারা কলেজের টিচারদের মধ্যে নুরুল হুদার নামই বলেছে।

নুরুল হুদা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারা কি তাকে চেনে? কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আলমারি সাজিয়ে রাখার সময় এক কুলি দাঁড়িয়েছিল তার গা ঘেঁষে! তখন তো ঘোরতর বর্ষাকাল, ঢাকায় এবার বৃষ্টিও হয়েছে খুব। রাতদিন এই বৃষ্টি নিয়ে সে কি যেন বলেছিল, তাতে কুলিটা বিড়বিড় করে ওঠে, ‘বর্ষাকালেই তো জুৎ’। কথাটা দুবার বলেছিল। এর মানে কী?

স্টাফরুমে কে একজন একদিন না দুদিন ফিসফিস করছিল, বাংলার বর্ষা তো শালারা জানে না। রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদেও জেনারেল মনসুন। –ওই ছদ্মবেশী ছেলেটা কি এই কথাই বুঝিয়েছিল? তার ওপর তাদের এত আস্থা? –উৎসাহে নুরুল হুদা এদিক-ওদিক তাকায়। তার মৌনতা মিলিটারিকে আরেকটু নিশ্চিত করে।

কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ পর সে বুঝতে পারে না, মিলিটারি তাকে ফের একই প্রশ্ন করে জবাব না পেয়ে প্রবল বেগে দুটো ঘুষি লাগায় তার মুখে। প্রথম ঘুষিতে সে কাত হয়, দ্বিতীয় ঘুষিতে পড়ে যায় মেঝেতে। মেঝে থেকে তুলে তাকে মিলিটারি ফের জিজ্ঞেস করে, ওদের আস্তানা কোথায় সে খবর তার তো ভালোভাবেই জানা আছে। সে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ'!

ওই ঠিকানাটা বলে দিলেই তো তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হবে এই নিশ্চয়তা দিয়ে তাকে পাউরুটি ও দুধ খাওয়ানো হয়। তাঁকে ভাবতে সময় দিয়ে মিলিটারি চলে যায়। কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ সে জানে না, মিলিটারি ফিরে এসে ফের বলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তো তার জানা আছে। সে ফের জবাব দেয়, হ্যাঁ'। কিন্তু পরের প্রশ্নের জবাব না পেয়ে মিলিটারি তাকে নিয়ে যায় অন্য একটি ঘরে। তার বেঁটেখাটো শরীরটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো ছাদে-লাগানো একটা আংটার সঙ্গে। তার পাছায় চাবুকের বাড়ি পড়ে সপাৎ সপাৎ করে। তবে বাড়িগুলো বিরতিহীন পড়তে থাকায় কিচুক্ষণের মধ্যে সেগুলো নুরুল হুদার কাছে মনে হয় স্রেফ উৎপাত বলে। মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের ওপর। রেইনকোটটা এরা খুলে ফেলেছে, কোথায় রাখল কে জানে। কিন্তু তার ওম তার শরীরে এখনো লেগেই রয়েছে। বৃষ্টির মতো চাবুকের বাড়ি পড়ে তার রেইনকোটের মতো চামড়ায় আর সে অবিরাম বলেই চলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে। শুধু তার শালার নয়, তার ঠিকানা জানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নাই, সে ছদ্মবেশী কুলিদের আস্তানাও চেনে। তারাও তাকে চেনে এবং তার ওপর তাদের আস্থাও কম নয়। তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

ক্রাক-ডাউনের রাত– ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা পরিচালনা করে সেই রাতের কথা বলা হয়েছে।**ছদ্মবেশী**-আত্মপরিচয় গোপন করেছে এমন।**মৌনতা–** নীরবতা। **রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইন্টার আমাদের জেনারেল মনসুন–** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় প্রচণ্ড শীতের কবলে পড়ে হিটলারের বাহিনী রুশ বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রবল বর্ষায় তেমনি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়েছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী। এখানে সেই বিষয়টির তুলনা করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

গেরিলা আক্রমণের ঘটনা যে রাতে ঘটে তার পরদিন সকালে ছিল বৃষ্টি। তলব পেয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা শ্যালক মিন্টুর রেইনকোটটি গায়ে দিয়ে নুরুল হুদা কলেজের দিকে রওনা দেয়। রেইনকোটটি গায়ে দেয়ার পর ভিতু প্রকৃতির নুরুল হুদার মধ্যে ভিন্ন অনুভূতির জন্ম হয়। নুরুল হুদার মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে ঢাকায় গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়েছে। তেমনই একটা ঘটনা এ গল্পের বিষয়। ঢাকা কলেজের সামনে গেরিলারা আক্রমণ করে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার ধ্বংস করে দেয়। আর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাক সেনাবাহিনী কলেজের শিক্ষকদের তলব করে। তাদের মধ্যে নুরুল হুদা এবং আবদুস সাত্তার মৃধাকে গ্রেফতার করে নির্যাতন চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খবর নিতে চেষ্টা করে। নুরুল হুদা প্রিন্সিপালের জরুরি তলবে কলেজে যাবার সময় বৃষ্টির জন্য তার মুক্তিযোদ্ধা শ্যালক মিন্টুর রেইনকোটটি পরে নেয়। মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীতু নুরুল হুদার ভেতর যে উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম দেখা যায় তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটেছে এ পাঠ্যাংশে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. অফিসের জন্য কয়টি আলমারি কেনা হয়েছিল?

ক. দুইটি
খ. তিনটি
গ. চারটি
ঘ. পাঁচটি

৬. পিয়নকে দেখে সবাই তটস্থ থাকেন কেন?

ক. আচরণের জন্য
খ. মিলিটারির কারণে
গ. রাজাকার বলে
ঘ. মিলিটারির সঙ্গে সুসম্পর্কে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি।

৭. উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের কার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. নুরুল হুদা
খ. সাজিদ আকবর
গ. আবদুস সাত্তার মৃধা
ঘ. ইসহাক

৮. উদ্দীপকে 'রেইনকোট' গল্পের কোন দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে?

i. দেশপ্রেম
ii. মানবিকতা
iii. নৃশংসতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ.ii.
গ.iii
ঘ. ii ওiii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'রেইনকোট' গল্পে কোথায় বোমা ফেলা হয়েছিল?

ক. কলেজের জিমনেশিয়ামে
খ. বাগানে
গ. প্রিন্সিপালের বাড়ির গেটে
ঘ. গেমস্ রুমে

১০. মসজিদের মাইক্রোফোন অকেজো হয়েছে যে কারণে?

ক. প্রিন্সিপালের ভয়ে
খ. কর্নেলের হুকুমে
গ. মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে
ঘ. বিদ্যুৎ না থাকায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে দেখা দিয়েছিল ভয় আর উৎকণ্ঠা। সে সময়ে অনেক তরুণই দেশের জন্য পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তারা ভয়কে জয় করেছে।

১১. উদ্দীপকের তরুণদের সঙ্গে 'রেইনকোট' গল্পে কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. মিন্টু
খ. ড. আফাজ আহমেদ
গ. নুরুল হুদা
ঘ. ইসহাক

১২. উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে–

i. নিষ্ঠুরতা
ii. সাহসিকতা
iii. স্বজনপ্রীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

মেলাঘর কতদূর ! মা কী কল্পনা করতে পারেন ? কিন্তু সেখানেই গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয় মায়ের ছেলে নাফি। নাফির চোখে স্বাধীন বাংলার স্বপ্নছবি লালসবুজের পতাকা। মেলাঘরে প্রশিক্ষণ শেষে নাফি মুক্তিবাহিনীর একটি গেরিলা ইউনিটে কমান্ডো হিসাবে কাজ করে। হৃদয়ের টানে তার নিকট মা আর মাতৃভূমি একাকার বলে মনে হয়।

ক. রেইনকোট পরার পর নুরুল হুদাকে কার মতো দেখাচ্ছিল?

খ. 'রাশিয়ার ছিল জেনারেল উইন্টার, আমাদের জেনারেল মনসুন' –কথাটির তাৎপর্য কী?

গ. উদ্দীপকের নাফি 'রেইনকোট' গল্পেকোন চরিত্রটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়? –আলোচনা করুন।

ঘ. উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের সমগ্র ভাব ধারণ করে কী? –মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর নিষ্ঠুর বর্বরতার ছবি। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে গ্রাম এলাকার আনসার, চৌকিদার-দফাদাররাও যে কখনো কখনো পরোক্ষ কৌশলে অত্যন্ত গোপনে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা করেছিল, সেই বাস্তবতাই শিল্প-সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে এ গল্পে। গ্রামবাংলার একজন সাধারণ দফাদারের দেশপ্রেম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় গল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ক. প্রিন্সিপালের উর্দুচর্চা নিয়ে ঠাট্টা করে কে?

খ. 'আব্বু তাহলে মুক্তিবাহিনী' –কথাটি কে, কোন প্রসঙ্গে বলেছিল?

গ. উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের কার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকে 'রেইনকোট' গল্পের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশিত হয়নি।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

রেইনকোট পরার পর নুরুল হুদাকে মিন্টুর মত দেখাচ্ছিল।

খ.

উক্তিটিতে বাংলাদেশে বর্ষার সুযোগে মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানি বাহিনীকে বিপর্যস্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হিটলার বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করতে গিয়ে বৈরি পরিবেশের মুখোমুখী হয়। রাশিয়ার প্রচণ্ড শীতে জার্মান বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। সেখানে শীতের ভূমিকা অনেকটাই প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেনারেলের মত হয়েছিল। আর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলেও বাংলাদেশের মৌসুমি আবহাওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলনা। ফলে তারা বাংলাদেশে বর্ষাকালে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। মোটকথা বর্ষা ঋতু বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য শাপে বর হয়েছে। তাই বর্ষাকালকে জেনারেল মনসুন বলা হয়েছে।

গ.

উদ্দীপকের নাফি চরিত্রটি 'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মুক্তিযুদ্ধ হাজার বছরের বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। মাতৃভূমি বাংলাকে শত্রুমুক্ত করতে এদেশের দামাল ছেলেরা ১৯৭১ সালে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মৃত্যুকে অজেয় করে তারা শত্রু হননের শপথ নেয়। তাদের বুকের রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলার সবুজ শ্যামল প্রান্তর।

উদ্দীপকে নাফি একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে মেলাঘরে গেরিলা প্রশিক্ষণ নেয়। অতঃপর সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মেলাঘর কতদূর তা তার মা কল্পনা করতে পারেন না। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাফি শত্রুসেনাদের নিশ্চিহ্ন করে। উদ্দীপকের নাফি চরিত্রটির মিল রয়েছে 'রেইনকোট' গল্পের মিন্টুর সঙ্গে। মিন্টুও বাসা

থেকে পালিয়ে গেরিলা যুদ্ধে দেয়। দেশকে শত্রুমুক্ত করতে সেও স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে।

ঘ.

উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের সমগ্র চেতনাকে ধারণ করে না।

স্বাধীনতা যে কোন জাতির স্বপ্নিল প্রত্যাশা। বাঙালি জাতি এ প্রত্যাশা পূরণ করেছে ১৯৭১ সালে। লাখো বাঙালির রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে এ প্রত্যাশা। বাংলা মায়ের বীর সন্তানেরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল এ যুদ্ধে।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে একজন তরুণের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা। নাফি নামের এই তরুণটি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে গেরিলা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। অথচ এটা তার মা কল্পনা করতে পারেন না। উদ্দীপকের এ বিষয়টিতে 'রেইনকোট' গল্পের একটি দিকমাত্র ফুটে উঠেছে। এটা দেখা যায় মিন্টুর মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের ঘটনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু 'রেইনকোট' গল্পে উক্ত বিষয়টি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ও উঠে এসেছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'রেইনকোট' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে ঢাকার আবহে রচিত। গল্পটিতে ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ, বর্বরতা, রাজাকারদের অত্যাচার, নুরুল হুদার ভীরুতা, প্রাণভয়ে ভীত মানুষের আহাজারি, সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে। 'রেইনকোট' গল্পটিকে এককথায় বলা যায় সমকালীন সময়ের সাহিত্যিক দলিল। উদ্দীপকে আলোচ্য গল্পটির উক্ত বিষয়গুলো ফুটে ওঠেনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের সমগ্র ভাব ধারণ করে না।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

প্লিজ, মেজর সাহেব, আই বেগ ইউ, প্লিজ, রহম কিজিয়ে, আমার বিবিকে ছেড়ে দিন। ওকে নিয়ে যাবেন না। আপনারা ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? দেন, কিল মি, প্লিজ, ফিনিশ মি, আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে চললেন? আউট সাইড? আমি শুনেছি, আপনারা আমাদের দিয়ে আগে গোর খুঁড়িয়ে নেন, তারপর গুলি করেন। প্লিজ, ব্রিং মাই ওয়াইফ ব্যাক; আমরা দুজনেই গোর খুঁড়ব।

ক. আকবর সাজিদ কোন বিষয়ের অধ্যাপক?

খ. নুরুল হুদাকে এক্সট্রা তটস্থ থাকতে হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'রেইনকোট' গল্পের কোন দিক দিয়ে মিল বা অমিল রয়েছে? –যুক্তিসহ উপস্থাপন করুন।

ঘ. "মুক্তিযুদ্ধে চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ।" –উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. ক ৪. খ ৫. খ ৬. ঘ ৭. ক ৮. ক ৯. গ ১০. ঘ ১১. ক ১২. ঘ